বিনোদন চ্যানেল বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রক

বিক্রেতা বেকহাম, শাহরুখ বা ব্রিটনি ক্রেতা আপনি এবং তারকাহীন এই ডাব

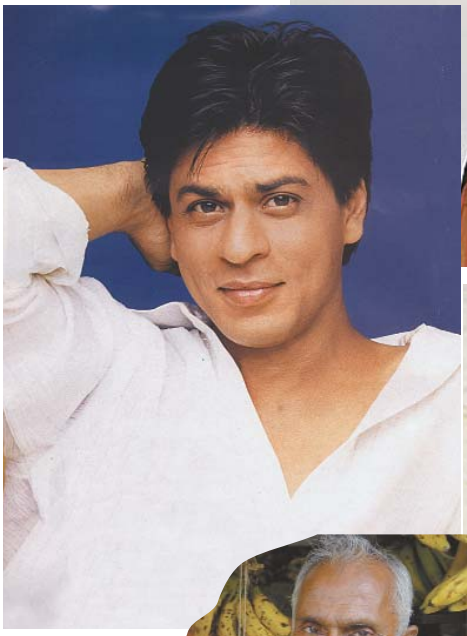

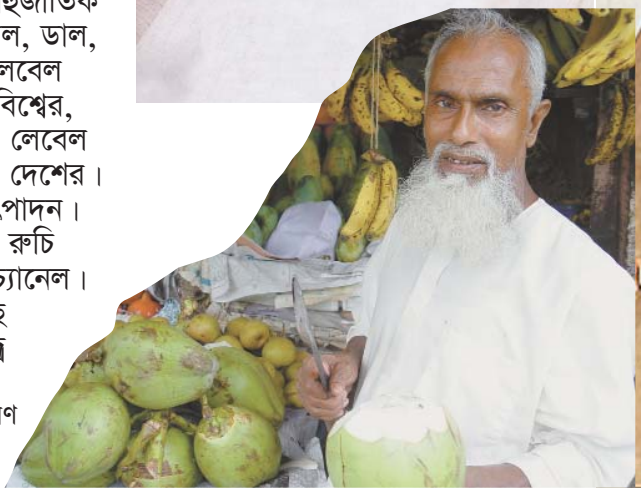

মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা। এখন চাল, ডাল, মাংস সবই কিনতে হয় লেবেল দেখে। কাঁচামাল তৃতীয় বিশ্বের, পণ্য তৈরি হচ্ছে চায়নায়, লেবেল বসছে পাশ্চাত্যের কোনো দেশের। তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে উৎপাদন। ক্রেতা আমরা। আমাদের রুচি নিয়ন্ত্রণ করছে বিনোদন চ্যানেল। বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে বিনোদন চ্যানেলকে কেন্দ্র করে ... এই বিশাল অচলায়তনের আংশিক বিশ্লেষণ করেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

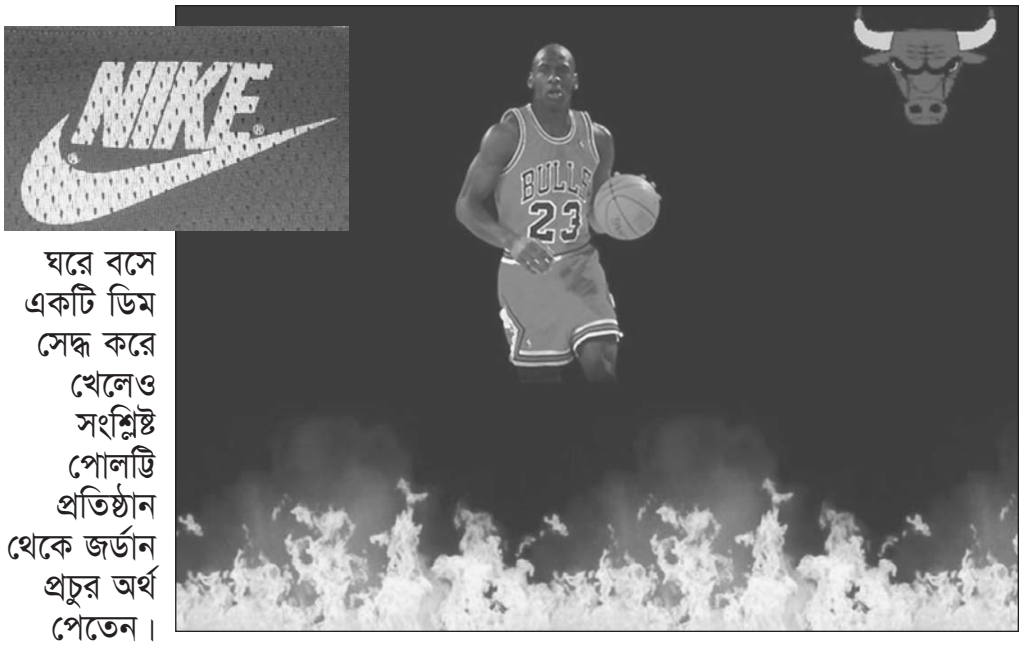

দৃশ্যপট ১

'তোমার জন্য মরতে পারি, ও সুন্দরী তুমি গলার মালা এই যে দেখো তোমার জন্য আনছি আরসি কোলা।' এই অ্যাড আরসি কোলা বিক্রি করছে আপনার ড্রাইং রুমে...

কিংবা শাহরুখ খান, কারিনা কাপুর, আদনান সামি'র পেপসির অ্যাড। 'ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর' স্লোগান নিয়ে উপমহাদেশে পেপসির যে যাত্রা, তাতে তারকারা যোগ করেছে নতুন মাত্রা। শাহরুখ, কারিনা কিংবা আদনান সামির পছন্দের পানীয় পেপসি বাংলাদেশেও তাদের ভক্তরা পান করছে।

অথবা আমির খান, ঋত্বিক রোশনের ভক্তরা। যাদের গলা ভিজছে কোকে।

অথচ আমাদের দেশে ডাবের পানি বিক্রি করে একজন আরজ আলী বা সোনা মিয়া। অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হবার পরও ডাবের পানি কেন ততটা জনপ্রিয় নয়? ২৫০ মি.লি পেপসি-কোক-আরসি কোলা এবং একটি মাঝারি আকৃতি ডাবের মূল্য সমান হবার পরও কেন এই অবস্থা? কারণ দুটি দু' পদ্ধতিতে বাজারজাত হচ্ছে। ডাবের পানির সঙ্গে আমরা কোনো তারকাকে যুক্ত করতে পারিনি। নোবেল, শাহরুখ খান, কারিনা, আদনান সামি, আমির খান, ঋত্বিক রোশনরা সাধারণকে ডাবের পানি খেতে আমন্ত্রণ জানায় না। তারা কিনতে বলে কোল্ড ড্রিংকস্। প্রিয় তারকার এ আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ঘরে বসে একটি ডিম সেদ্ধ করে খেলেও সংশ্লিষ্ট পোলট্রি প্রতিষ্ঠান থেকে জর্ডান প্রচুর অর্থ পেতেন।

কারণ জর্ডান মানেই ছিলো তারুণ্যের ক্রেজ, বিপণনের হাতিয়ার। শুধু জর্ডানের কারণেই ঐসব সিনেমা হল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিংবা পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠতো। এজন্য তাকে কয়েক লাখ ডলার দিতে তারা কার্পণ্য বোধ করতো না

দৃশ্যপট ২

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। খেলোয়াড়ি দক্ষতা যার প্রশ্নাতীত। সেই সঙ্গে রয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা। বাঙালি 'দাদা' হিসেবে বাংলাদেশে তার ভক্তের সংখ্যা বেশি। এই সৌরভ কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য খেলা নয়, একটি অ্যাড করা। তার করা ড্যানিসের অ্যাডটি যেদিন অন এয়ারে গেলো, সে দিন থেকেই বিক্রি বেড়ে গেলো পণ্যটির। অথচ ড্যানিসের গুণগত মানে কোনো পরিবর্তন আসেনি। শুধু পণ্যটির সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলির নাম যুক্ত হবার কারণে বেড়ে যায় এর বিক্রি।

দৃশ্যপট ৩

মেয়েদের সাবান হিসেবে এক সময় বাংলাদেশে লাক্স ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। গ্রামের মেয়ে মর্জিনা কিংবা শহরের অ্যানি- উভয়কেই জানানো হয়েছিল 'বিশ্বজুড়ে তারকাদের প্রিয় সাবান লাক্স'। টিভি পর্দায় লাক্সের অ্যাড করতেন সুবর্ণা মুস্তাফা কিংবা মৌসুমীর মতো তারকা। মর্জিনা, অ্যানির কাছে তারা ছিলো আইকন। ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এসব আইকনের প্রিয় সাবান তারা তো ব্যবহার করবেই। আনন্দধারা-লাক্স ফটোজেনিক অপি করিম তো হয়ে উঠেছেন লাক্স আইকন। প্রতিবছর মিস ফটোজেনিকরা সারা দেশ থেকে আসছে লাক্সের পথ ধরে।

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। না, এটা বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপন নয়। আসলে পৃথিবীর মানুষ চলে এসেছে কাছাকাছি। নিউইয়র্কের সাবওয়েতে অফিস ফেরত ব্যস্ত যাত্রী যেমন কিনছে 'সোডা-কোলা' তেমনি এখানকার গৌরনদীর মামুন ও পিপাস একই পানীয় কিনছে। লাক্স সাবান পৌঁছে গেছে তারকার বাথটব থেকে মর্জিনার পুকুর ঘাটে।

যুদ্ধ করছে মানুষ ইরাকে, মতান্তর ঘটছে জাতিসংঘে। কিন্তু ক্রেতা হিসেবে মানুষ বিশ্বজুড়ে ঐক্যবদ্ধ, ক্রেতা হিসেবে এক লাইনে, এক কাতারে আছে।

কলম্বাস ড্রেকের মহাদেশ 'আবিষ্কারে'র মাধ্যমে শুরু। তারপর শতাব্দীব্যাপী উপনিবেশ লুণ্ঠন। তখনই উপরিকাঠামোয় তৈরি হয়ে যায় 'শ্রেণী'। এখানেই আসে 'মান' 'ভ্যানিটি'। লুণ্ঠনকারীরা তাদের শিক্ষা লেবাস সামাজিক ধারা রীতিনীতি রেখে গেল প্রতিনিধিদের কাছে। বিভাজিত থাকলো সমাজ। উৎপাদন শ্রেণী থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এই অবস্থানে যাওয়াই জীবনের সর্বত্র লড়াই। লুঙ্গি থেকে প্যান্টে, ডাব থেকে কোলায় আসতে চায় সবাই।

এগুলো পুরনো প্রসঙ্গ, আগেই আলোচিত।

এখন পৃথিবী ছোট হয়েছে, একত্র হয়েছে ক্রেতা হিসেবে। মনন, চেতনা, মানবতা, ধর্ম, ভালোবাসা যে ঐক্য আনতে পারেনি, সেই ঐক্য এসেছে ক্রেতা হিসেবে।

বিশ্বের এ শতাব্দীতে মূল ব্যবসাই হবে এন্টারটেইনমেন্ট এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি কেন্দ্রিক। এর মাধ্যমে নির্মিত হবে ক্রেতা, নিয়ন্ত্রিত হবে বিশ্ব বাণিজ্য। প্রথমেই যে তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। তারকা তৈরি করা হচ্ছে, তারাই বিক্রেতা হিসেবে প্রতিমুহূর্তে হাজির হচ্ছে একেবারে আমাদের বেডরুমে। বেডরুমের ছোট পর্দায় গায়িকা ব্রিটনি স্পেয়ার্স এসে দাঁড়াচ্ছে মাইকেল জর্ডানের মতো বাস্কেটবল নিয়ে 'আসক্ ফর মোর' বলে। পেপসি এর জন্যে ব্রিটনিকে দেবে ৩০ মিলিয়ন ডলার। এ টাকা গান গেয়ে উপার্জনের চেয়ে অনেক বেশি। বিশ্বব্যাপী পেপসি/কোকের মূল্যযুদ্ধে লাভবান হচ্ছে প্রতিটি আন্তর্জাতিক তারকা।

এক্ষেত্রে পণ্য তৈরিতে যতো টাকা খরচ হয়, তার দ্বিগুণ, তিনগুণ, এমনকি চার-পাঁচগুণ টাকা ব্যয় করা হয় প্রচারণায়। ২৫০ মি.লি'র এক বোতল কোক বা পেপসি তৈরি করতে খরচ হয় বড়জোর ২-৩ টাকা। অথচ এটা বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়। সাধারণ হিসাবে এসব প্রতিষ্ঠান বোতল প্রতি লাভ করে ৭-৮ টাকা। আসলে ঘটনা সেটা নয়। বোতল

প্রতি এতো বিশাল লাভ যদি তারা করতে চায় তো, তাহলে আদৌ তারা খুব বেশি লাভ করতে পারতো না। পণ্য তৈরি ব্যয় ২-৩ টাকা হলেও প্রচারণায় তারা খরচ করে বিশাল অঙ্কের টাকা। ঋত্বিক, শাহরুখ খানকে দিয়ে অ্যাড করায়। নিজেদের পণ্যের গুণাগুণ গাওয়ায়। এ প্রচারণা কৌশলের কারণে বোতল প্রতি এসব প্রতিষ্ঠান ২/৩ টাকার বেশি লাভ করতে পারে না। অথচ তারকাদের পছন্দের পানীয় বলে বিশাল জনসাধারণ কোক/পেপসি পান করছে। পণ্যের মূল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যোগ করছে তারকা মূল্য। এ দু'য়ের যোগফলে প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ বোতল পানীয় বিক্রি হচ্ছে। বাংলাদেশে বাজার ক্রমে বাড়ছে। আগে এটা ছিল রিকনডিশন গাড়ির বাজার। এ বছর মার্সিডিজ বিএমডব্লিউ দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। সদ্য বেড়াতে আসা এক ইমিগ্রান্ট বাংলাদেশী চার বছর পর দেশের অবস্থা দেখে অবাক। আগে বিদেশ থেকে এলে চাইতো সাবান, শ্যাম্পু থেকে যেকোনো জিনিস। এখন যেকোনো শৌখিন জিনিস।

বাংলাদেশ একটি অনুন্নত দেশ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। যদিও দেশের প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই উন্নতির কোনো ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই অনুন্নত দেশটির প্রতি বিশ্ব বাজারের রয়েছে শ্যেন দৃষ্টি। কেন? কারণ এদেশের ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর প্রায় সব পণ্যেরই সবচেয়ে বড় ক্রেতা যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে কথা তো সবারই জানা। বাংলাদেশ ১ লাখ ৪৫ হাজার বর্গমাইলের একটি ছোট দেশ। অথচ এর জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিশাল এই ক্রেতাশ্রেণীর কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কদর ফেলে দেবার মতো নয়। এটাকে বাড়ানোর জন্য আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চিন্তার শেষ নেই।

তবে এখানে একটি হিসাব বেশ অবাক করার মতো, তা হলো সিগারেট বিপণন। প্রিমিয়াম ব্যান্ড ভারতে চলে না। অথচ বাংলাদেশে প্রিমিয়াম ব্যান্ডের বাজার রমরমা। খেলা ও মিউজিকের ওপর ভর করে ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি চমৎকার আভিজাত্য জুড়ে দিচ্ছে ব্রান্ডের সঙ্গে। তাছাড়া এখানে শ্রেণী উত্তরণের প্রক্রিয়া ঘটছে দ্রুত। একজন রাজনীতিবিদ বা মাস্তান শ্রেণী উত্তরণের তাৎক্ষণিক ঘুষের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় এই প্রিমিয়াম ব্রান্ড। যে আকিজ বিড়ি খায় সে সেটা ছেড়ে দ্রুত প্রিমিয়াম ব্রান্ড ধরতে চায়। এটাতে তার স্ট্যাটাস মুহূর্তে বেড়ে যায়। এখানে স্ট্যাটাস বোঝানোর জন্য আমাদের দামী সিগারেট খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যে কারণে সমগ্র বিশ্বের ভেতর বাংলাদেশে গোল্ড লিফ্ কিংবা বেনসনের ক্রেতা সর্বাধিক।

এই জনপ্রিয়তাকে ঠিকই কাজে লাগিয়েছে কোমল পানীয় প্রতিষ্ঠান পেপসি। তাদের চুক্তিবদ্ধ করেছে। তাদের দিয়ে অ্যাড করিয়েছে। যে তরুণ-তরুণীটি আগে কোনো পানীয়ই পান করতো না অথবা অন্য কোনো পানীয় পান করতো, সে হয়তো শুধু জেমসের ভক্ত হবার কারণে এখন দোকানে গিয়ে বলছে 'একটা পেপসি হবে?'

অসমর্থিত তথ্যে একথাই বলা হয়েছে।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত উন্নত। সেখানে তারা ৫০ কোটি রুপি ব্যয়েও একটি সিনেমা তৈরি করে। সে টাকা প্রযোজকরা আবার ঘরেও তুলে নেন। কারণ ভারতে ফিল্ম স্টারদের ইমেজ দেবতার মতো। একজন শাহরুখ খান কিংবা একজন মাধুরী দীক্ষিত সে দেশের জাতীয় প্রতীক। এদের ছবি মাঝে মধ্যে ফ্লপ করে কিন্তু তারা ছোট পর্দায় থেকেই যাচ্ছেন পেপসির দিল মাঙ্গে মোর বা ময়ূর খান হিসেবে। অর্থাৎ তারকাকে ব্যবহার করছে দ্রব্য বিক্রেতারা এবং তাকে আরো বড় করে তুলছে দর্শকদের কাছে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনে ছোট পর্দায় চলচ্চিত্র তারকা সেভাবে আসছে না কারণ দর্শক জরিপে দেখা গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হলে গিয়ে ছবি দেখে না। শাবনূর বা পপি জনপ্রিয় যাদের কাছে তারা মধ্যবিত্ত ক্রেতা নয়। আমরা এক্ষেত্রে কোনো আইকন তৈরি করতে পারিনি। একজন মান্না কিংবা একজন পূর্ণিমাকে আমরা আদর্শ বাঙালি নর-নারী হিসেবে মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া হলের দুরবস্থা, টিকিট কালোবাজারি, মাস্তানির ভয়ে মধ্যবিত্ত হলে যাওয়া ত্যাগ করেছে। মানুষ সিনেমা দেখতে আগের মতো হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। এ তুলনায় বাংলাদেশের সঙ্গীতের অবস্থা বেশ ভালো। বিশেষ করে ব্যান্ড সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের তারুণ্য ঘোষণা করেছে তাদের একাত্মতা। জেমস, আইয়ুব বাচ্চুর প্রভাব তাদের ওপর সীমাহীন। সেটা ভালো-খারাপ উভয় অর্থেই। কিন্তু এই জনপ্রিয়তাকে ঠিকই কাজে লাগিয়েছে কোমল পানীয় প্রতিষ্ঠান পেপসি। তাদের চুক্তিবদ্ধ করেছে। তাদের দিয়ে অ্যাড করিয়েছে। যে তরুণ-তরুণীটি আগে কোনো পানীয়ই পান করতো না অথবা অন্য কোনো পানীয় পান করতো, সে হয়তো শুধু জেমসের ভক্ত হবার কারণে এখন দোকানে গিয়ে বলছে 'একটা পেপসি হবে?'

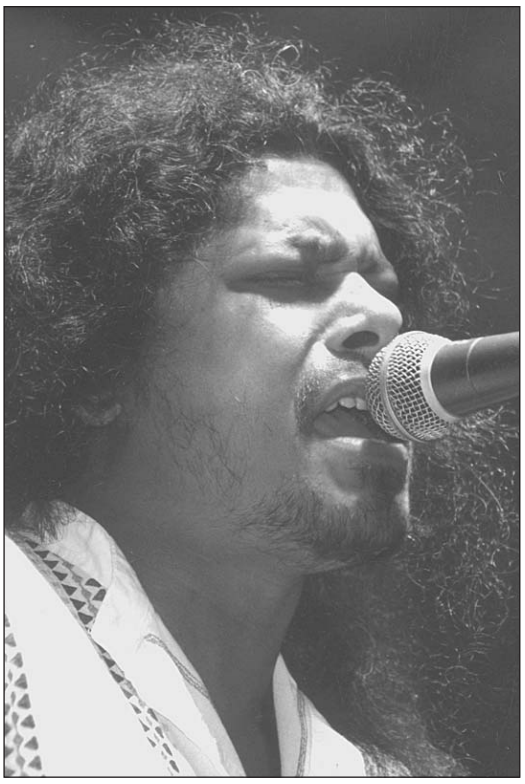

পণ্যের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারকাদের মূল্যও বাড়ছে সমানুপাতিক হারে। আগে তারকারা তাদের কাজের যে সম্মানী পেতেন, এখন পান তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। আশির দশকের একজন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী লিনু বিল্লাহ। অথচ তিনি সঙ্গীত জগতে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। জীবিকার তাগিদে নিজের চাকরি ও স্ত্রীর বিউটি পার্লার ব্যবসা নিয়ে খুশি। ঘরোয়া এক আড্ডায় আফসোসের সুরে বলেছিলেন যে, টাকা ছিল না বলে গান ছাড়তে হয়েছিলো। অথচ '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে লিনু বিল্লাহ্‌র চেয়ে অনেক কম শিল্পমূল্যের শিল্পী লাখপতি বনে যান। গানের সামগ্রির দাম কমেছে, ঘরে ঘরে চলছে সিডি প্লেয়ার।

এখন মিক্সড অ্যালবামে প্রতিটি

গানের জন্য জেমস্ নেন ১ লাখ টাকা। আইয়ুব বাচ্চুর ক্ষেত্রে অঙ্কটা ৬০-৮০ হাজার টাকা। প্রতিটি ব্যান্ড অ্যালবামের জন্য নগরবাউল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে পায় ১৪ লাখ টাকা। এলআরবি এক্ষেত্রে নেয় ৮-১০ লাখ টাকা। একক অ্যালবামের জন্য আসিফ, মনির খান নেন যথাক্রমে ১১ লাখ ও সাড়ে ৭ লাখ টাকা। এন্ড্রু কিশোর, তপন চৌধুরীরা অ্যালবাম প্রতি গড়ে ৬ লাখ টাকা করে পান। এই গায়করা গান গেয়ে ঢাকার অভিজাত এলাকায় বাড়ি কেনেন, দামী গাড়িতে ঘুরে বেড়ান।

আধুনিক বিশ্বের কাছে ক্রেতাশ্রেণীর কদর সবচেয়ে বেশি। একটি দেশের জনসংখ্যা কতো সেটা মুখ্য বিষয় নয়। বরং এ জনসংখ্যার কতোটা অংশ ক্রেতা সেটাই মুখ্য। যে ক্রেতা নয়, যার ক্রয় ক্ষমতা নেই, বিশ্বের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। সমাজের মধ্যবিত্তরাই মূলত ক্রেতা।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধ্যবিত্ত বসবাস করে ভারতে। এ কারণে ভারতের বাজার ধরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বড় টার্গেট। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করছে ভারতীয় তারকাদের। তাদের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করছে সাধারণের জীবনযাপনের ধরন।

ভারতীয়দের কাছে দুটো জিনিস ধর্মের সমপর্যায়ের– সিনেমা এবং ক্রিকেট। ফিল্মস্টার এবং ক্রিকেটারদের সাধারণ ভারতীয়রা দেবতার আসনে বসায়। তাদের রীতিমতো পূজা করে। এ দেবতারা যখন কোনো পণ্যের ফেরিওয়ালা হয়ে তাদের দুয়ারে আসেন, তখন তাদের ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না।

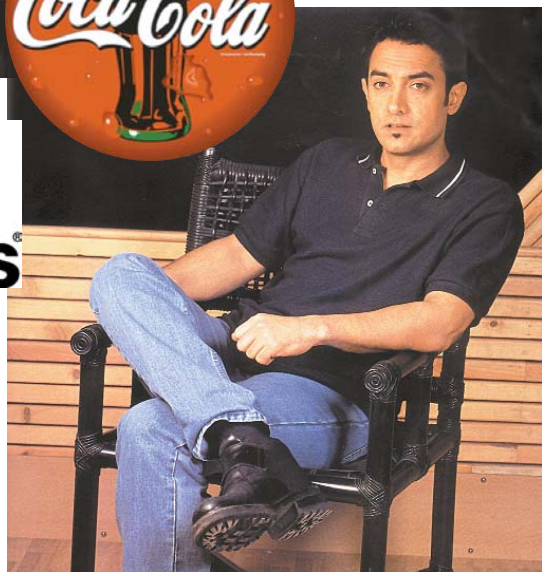

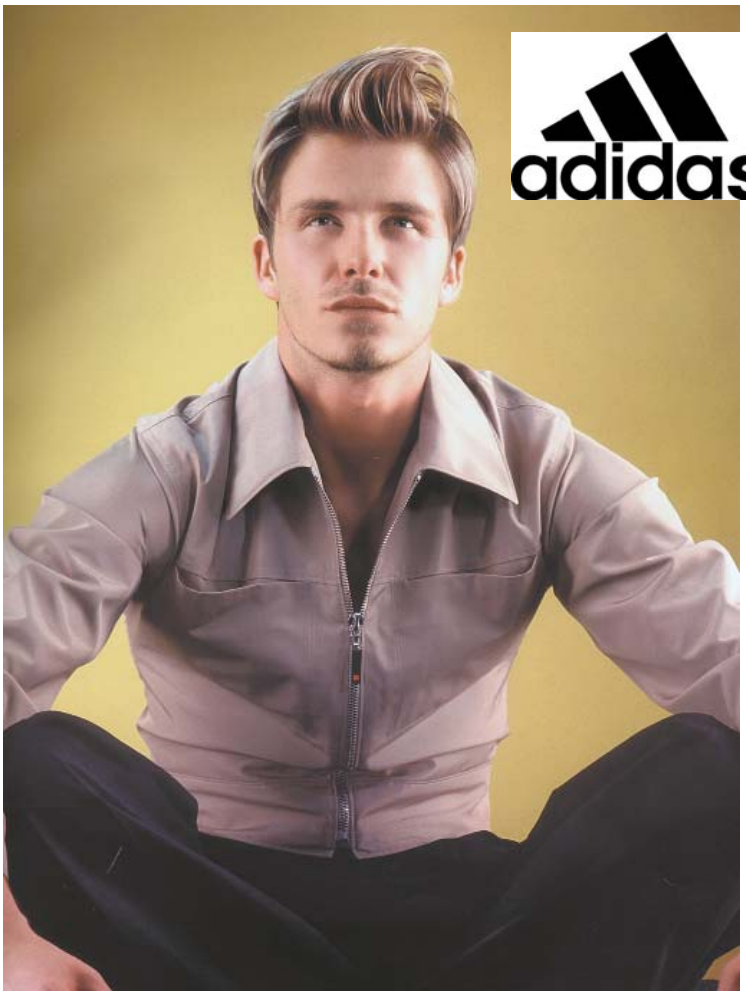

'৯০ সালে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই সময় রাশিয়া ধসে পড়লো। চীনে লাগলো বদলের হাওয়া। ভারতে চালু হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি। প্রায় সংযুক্ত বিশাল ভূখন্ড যেখানে বাস বিশ্বের ৩০০ কোটি মানুষের, সেখানে একই সময় একই সঙ্গে পরিবর্তন শুরু হলো। ভারতে '৯০-এর দশকের শুরুতে মুক্তবাজার অর্থনীতির জোয়ারে স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু হয়। মনমোহন সিং 'জি' চ্যানেলের স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করলেন। এই চ্যানেলের মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়দের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ শুরু হলো। পরবর্তীতে আরো অনেক চ্যানেল আরো নানা উপায়ে একই কাজ শুরু করলো। স্যাটেলাইটের কল্যাণে নিজ দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে তাদের প্রভাবের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়লো

আসলে আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রই প্রভাবিত করছে তারকারা। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। তারাই ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কি খাবো, কি পরবো, কেমন হবে আমাদের জীবন যাপনের ধরন

বিশ্বব্যাপী। ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সঞ্জয় দত্ত, সালমান খানের মাধ্যমেই তরুণ প্রজন্ম আগ্রহী হয়েছে বডি বিল্ডিংয়ে। কারিনা, শিল্পা শেঠীকে দেখে ভারতীয় নারীও হয়েছে ফিগার সচেতন। নতুন প্রজন্ম এখন ফারদিন খানের মতো সানগ্লাস পরে, কারিনার মতো মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। আগে ছেলেদের মাসলম্যান বডি কিংবা মেয়েদের ক্ষীণ কটিসমৃদ্ধ ফিগারের প্রতি কোনো মোহ ছিলো না। এখন সে মোহ জন্মেছে। আর এটাতে মূল ভূমিকা রেখেছে তারকারা। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নেমে ভারতীয় চ্যানেলকে প্রায় সেন্সরমুক্ত করা হয়েছে। এখনকার তারকারা সাহসী চরিত্রে পর্দায় আসছে।

ভারত এন্টারটেইনমেন্টের জগতে বাজারে হলিউড-পাইনউডের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রবেশ করেছে। দ্বিভাষিক ছবি মুক্তি পাচ্ছে লন্ডন ও নিউইয়র্কের প্রধান প্রেক্ষাগৃহে। হিন্দি চ্যানেল বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এবং দামী। সিনেমা প্রতি ভারতীয় তারকারা যে পারিশ্রমিক নেন, সেটা মাথা ঘুরে যাবার মতোই ব্যাপার। অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, শাহরুখ খান, ঋত্বিক রোশনরা সিনেমা প্রতি ২.৫-৩.৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন। ঐশ্বরিয়া, কারিনারা পান ১.২৫-১.৭৫ কোটি রুপি। এতোটা পারিশ্রমিক পাবার পেছনে কারণও রয়েছে। শোনা যায় বিজ্ঞাপনমূল্য এই অঙ্কের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এক সময় যখন শোলে তৈরি হয় তারপর অমিতাভ অবিশ্বাস্য অঙ্কে সাইন করতেন। কিন্তু এখন তিনি কৌন বানেগা ক্রোড়পতিতে যা পেয়েছেন তা হয়তো তার সারা জীবনেও পাননি। কারণ এই অনুষ্ঠান চ্যানেলে স্পন্সর করেছে পানের মশলা থেকে মোটর সাইকেল নির্মাতারা। এখন তারকারা তার অভিনয়, খেলা বা গানে যা উপার্জন করেন তার চেয়ে বেশি আসে বিজ্ঞাপন থেকে।

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্রেতা শ্রেণীর কদর সবচেয়ে বেশি। সে কারণে তাদের কাছে ভারতের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভারত ছাড়াও ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে ক্রেতা শ্রেণী। সে কারণে ভারত কিংবা ল্যাটিন আমেরিকা অথবা আফ্রিকার কোনো দেশ থেকেই বারবার মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হন। এদের কাজে লাগানো যায় বিজ্ঞাপনে। কারণ তাদের জনপ্রিয়তা থাকে অনেক বেশি। উন্নত বিশ্বের অত্যাধুনিক মার্কেটিং পলিসির কারণে এসব দেশ থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন বিশ্বসুন্দরীরা। সেখানে তাদের নিজস্ব যোগ্যতা কতটুকু, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। চীনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সেই সঙ্গে ক্রেতা শ্রেণীও ক্রমেই বাড়ছে। হয়তো আগামী ২-১ বছরের মধ্যেই আমরা চীন থেকে কাউকে বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হতে দেখবো।

এরপর হয়তো আসবে কোন কোম্পানির সিল। গ্রামের কিশোরী বড়ই খাবে না, কিশোর ছেলেটি স্মৃতিকথায় পেয়ারা গাছের কথা বলবে না, আরজ আলীর ডাব হবে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। অথবা সবই চলে যাবে কোম্পানি সিলে। সেটা হতে পারে মাল্টিন্যাশনাল বা প্রাণ। যেমন এখন গরুর দুধ বলি না, বলি আড়ং দুধ বা মিল্ক ভিটা

শোনা যায়, ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশে চায়ের প্রচলন করেছিলো বড় অদ্ভুতভাবে। শুরুতে তারা এখানকার অধিবাসীদের বিনামূল্যে চা খাওয়াতো। পরে এক সময় যখন চা জনগণের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে গেলো, তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চা নিজস্ব স্থান করে নিলো তখনই ব্রিটিশরা বিনামূল্যে চা বন্ধ করলো। কিন্তু ততোদিনে প্রায় নেশায় পরিণত হওয়া চা উপমহাদেশবাসী টাকা দিয়ে কিনেই পান করতে বাধ্য হলো। আধুনিক বিশ্বে পণ্য বিক্রিতেও অনেক সময় এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। শুধু তারকারা কনজ্যুমার আইটেম নয় দেশও বিক্রি করে। যেমন হিন্দি ব্লকবাস্টার সুপারহিট ছবি 'কহো না পেয়ার হ্যায়'। এ ছবির মাধ্যমেই তারকাখ্যাতি পেয়েছে ঋত্বিক রোশন। ছবিটির একটি বড় অংশের শুটিং হয়েছে নিউজিল্যান্ডে। শোনা যায়, সেখানে শুটিংয়ের সমস্ত খরচ বহন করেছিলো নিউজিল্যান্ড ট্যুরিস্ট কর্পোরেশন এবং নিউজিল্যান্ড এয়ারলাইন্স। তারা শুধু শুধু এমনটা করেনি। তারা সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলো নিউজিল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকৃষ্ট করবে পর্যটকদের। আর যেহেতু ভারতের সিনেমা মার্কেট বিশাল, তাদের দর্শক ভারতবর্ষ ছাড়াও ইংল্যান্ড, আমেরিকায়ও প্রচুর আছে, সেজন্য 'কহো না পেয়ার হ্যায়' ছবির মাধ্যমে তারা তাদের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর বিশাল এক বিজ্ঞাপন করে। এ ছবির শুটিংয়ের খরচ হয়তো তারা বহন করেছে। কিন্তু এ ছবি দেখে যেসব পর্যটক নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে আসবে, তাদের কাছ থেকে সেই পয়সা ঠিকই সুদে-আসলে উসুল করে নেবে। বিনোদনের মাধ্যমে, তারকাদের মাধ্যমে পণ্য প্রচারণার এ নতুন ধারণা বিশ্বের মার্কেটিং পলিসিকেই এক নবগতি প্রদান করেছে।

একদা খেলা ছিল শুধুই খেলা। এটা থেকে খেলোয়াড়রা যা উপার্জন করতেন সেটা কম ছিল না। কিন্তু খেলা যখন চলচ্চিত্রের মত স্যাটেলাইটে চলে এলো তখন ক্লাব ও ব্যক্তিরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠলো। এতে প্রাইজমানি বাড়লো, পেলো টিভি শো'র অংশ। তারপর এলো বিজ্ঞাপন। খেলা হয়ে উঠলো এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলের সবচে' আকর্ষণীয় বিষয়।

সাধারণ ভারতীয়দের কাছে ক্রিকেটারদের স্থানও দেবতুল্য। শচীন টেন্ডুলকারের কথা তাদের কাছে দেবতার বাণীর মতো। এই দেবতাকে কাজে লাগায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচারণায়। দেবতার কথা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। সে কারণে একজন ক্রিকেটপ্রেমী সাধারণ ভারতীয় কোল্ড ড্রিংক্স কিনতে গেলে পেপসি কেনেন, স্পোর্টস ওয়ার কিনতে গেলে এডিডাস কেনেন, 'সিক্রেট অব শচীন'স এনার্জি হিসেবে বুস্ট কেনেন, ভিসা কার্ডস, টিভিএস ভিক্টর, টুডে'স পেন কেনেন। এসব পণ্য যতোটা না বিক্রি হয় নিজ গুণে, তারচেয়ে বেশি বিক্রি হয় শচীনের গুণে। পণ্যের গুণগত মানের সঙ্গে যুক্ত হয় শচীনের 'ব্রান্ড নেম'। সাধারণ ভারতীয়দের কাছে সে পণ্যের চাহিদা সব সময়ই থাকে তুঙ্গে।

ক্রিকেট খেলা ফুটবলের মতো বিশ্বের সব অঞ্চলে ততোটা জনপ্রিয় নয়। তবুও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে এ খেলার প্রচলন আছে। ১০টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন ৫টি মহাদেশে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য কোনো দেশের ক্রিকেটাররা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মতো সচ্ছল না। ম্যাচ ফি কিংবা প্রাইজমানি তারা হয়তো বেশি পায়। কিন্তু ভারতীয়রা অ্যাড করে যে টাকা উপার্জন করে, সেটা অবিশ্বাস্য। অকল্পনীয়। অন্যান্য দেশের ক্রিকেটারদের কাছে রূপকথার গল্পের মতো। এ কারণে কোনো দেশের ক্রিকেট সূচিতে ভারত সফর থাকলে সে দেশের ক্রিকেটাররা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। অ্যাড করে দুটো পয়সা তো আয় করা যাবে! ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এমনকি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা ভারতে এসে বিভিন্ন পণ্যের অ্যাড করেন। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের তারকাদের পাশাপাশি ভিনদেশী তারকাদের জনপ্রিয়তাকেও পণ্যের প্রচারণায় কাজে লাগান।

ভারতে এখন প্রচুর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। সাধারণ ভারতীয়দের ধারণা, একবার ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, জাতীয় দলে সুযোগ পেলে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে

না। অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হবে না। ধারণাটা অনেকাংশে সত্যি। না হলে একটি টুর্নামেন্টে ভালো খেলার পরই যুবরাজ সিংকে নিয়ে পেপসি-কোকের মধ্যে টানাহেঁচড়া চলার কথা নয়। চার মেরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জেতানোর পর ঋষিকেশ কানিতকারকে জাতীয় বীর বানানো হতো না। এ সবই করা হয় তাদের তারকামূল্যকে কাজে লাগানোর জন্য। ভারতীয় প্রায় সব ক্রিকেট তারকাই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচারক। সৌরভ গাঙ্গুলির চুক্তি রয়েছে পেপসি, হিমানি সোনা চান্দি, সাহারা, ব্রিটানিয়া, টাইগার, হিরো হোন্ডা ও স্যামসাংয়ের সঙ্গে। রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তি কিষাণ, ক্যাস্ট্রোল, পামোলিভ, রিবকয়ের সঙ্গে। শেওয়াগ স্যামসাং, কোক, ব্রিটানিয়া, হিরো হোন্ডা; হরভজন সিং ব্যাংক অব পাঞ্জাব, রেব্যান, পেপসি; সঞ্জয় বাঙ্গার, কোক, ব্রিটানিয়া, হিরো হোন্ডা; ভিভিএস লক্ষণ পেপসি, রেব্যান; মোহাম্মদ কাইফ ব্রিটানিয়া, পেপসি এবং জহির খান, যুবরাজ সিং পেপসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। দেখা যাচ্ছে, ভারতের বড় বড় সব ক্রিকেটার সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা প্রতিবছর এসব প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ পান। বিনিময়ে তাদের পণ্যের প্রচারণা চালান। সেই প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষ ঐসব পণ্য কেনে। যে কারণে শচীন টেন্ডুলকারের বাৎসরিক আয় ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিপুল অর্থ শচীনকে দিতে প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো কার্পণ্য করে না। কারণ তারা জানে এর বিনিময়ে তারা ২ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রির পথ প্রশস্ত করেছে।

পৃথিবীর সর্বকালের সবচেয়ে বড় এন্টারটেইনারের মধ্যে বক্সার মোহাম্মদ আলী অন্যতম। অথচ তার কিন্তু বেশি অর্থ-সম্পদ ছিলো না। মেরিলিন মনরোকে দিয়ে প্লেবয় ম্যাগাজিন নিজেই একটি আইকনে পরিণত হয়েছিলো। মনরো তার ৩৬ বছরের ছোট জীবন খ্যাতির সাগরে ভেসেই কাটিয়েছেন অথচ তারও কিন্তু খুব বেশি অর্থ ছিলো না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসব তারকাকে বিজ্ঞাপনে সেরকমভাবে কাজে লাগায়নি। যে কারণে গ্রেটা গার্বোর মতো বিখ্যাত তারকা বেভারলি হিল্‌সে বাড়ি করে পত্রিকার শিরোনাম হন। আর আজকের মাইকেল জ্যাকসন নিজের বসবাসের জন্য মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা কিনে নিলেও ততোটা আলোচিত হন না।

একজন তারকা একাই একটি প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। মাইকেল জর্ডানের কথাই ধরা যাক। MJ নিকনেমের এই বাস্কেটবল কিংবদন্তি খেলাটির জনপ্রিয়তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার বলা 'জাস্ট ডু ইট' নাইকির বাজার আকাশ ছোঁয়া করে তুললো। এদিকে তার নেতৃত্বে শিকাগো বুলস ১৯৯১ সালে এনবিএতে প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে। সমগ্র বিশ্বজুড়ে তখন বাস্কেটবলের দর্শক ছিলো মাত্র ১৫০ মিলিয়ন। কিন্তু পরবর্তী ৫ বছরে দর্শক সংখ্যা বেড়ে এর দ্বিগুণ হয়ে যায়। এদের অনেকেই শুধুমাত্র জর্ডানের খেলা দেখে বাস্কেটবলের ভক্ত হয়েছে। মাইকেল জর্ডান একক প্রচেষ্টায় স্পোর্টসওয়ার প্রতিষ্ঠান নাইকিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাইকি জুতা, টি-শার্ট ও অন্যান্য স্পোর্টস ওয়্যারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন জর্ডান। প্রথমবার তিনি যখন অবসর নেন, তখন মার্কেটে নাইকির চাহিদা ৩০% কমে গিয়েছিলো। গ্যাটোরেড, এমসিআই ওয়ার্ল্ডকম, রেইওভ্যাক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জর্ডানের চুক্তি ছিলো। তার কারণেই ১৯৯৫ সালের পরে বছর রেইওভ্যাক ব্যাটারির বিক্রি ৫% বৃদ্ধি পায়। যার মূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার। এমসিআই ওয়ার্ল্ডকম জর্ডানের সঙ্গে পরে তাদের আয় পূর্বের ছয় মাসের চেয়ে ২৫% বৃদ্ধি করে। ১৯৯০ সালে জর্ডান গ্যাটোরেড-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এ সময় তাদের বিক্রি ছিলো ৬৮১ মিলিয়ন ডলার। অথচ মাত্র ৭ বছরের ভেতর ১৯৯৭ সালে এই বিক্রি বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এসব প্রতিষ্ঠান, এমনকি স্বয়ং বাস্কেটবল তথা এনবিএ'র আয়কেও তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৯৬ সালে এনবিএ মোট আয় করে ৩ বিলিয়ন ডলার। যার ৩০% মাইকেল জর্ডান ও তার দল শিকাগো বুলসের আয়। জর্ডান কোনো হলে গিয়ে সিনেমা দেখলে হল কর্তৃপক্ষ তাকে লাখ লাখ ডলার দিতো। যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে তিনি পণ্য কেনেন, সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এমনকি ঘরে বসে একটি ডিম সেদ্ধ করে খেলেও সংশ্লিষ্ট পোলট্রি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি প্রচুর অর্থ পেতেন। কারণ জর্ডান মানেই ছিলো তারুণ্যের ক্রেজ, বিপণনের হাতিয়ার। শুধু জর্ডানের কারণেই ঐসব সিনেমা হল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিংবা পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসা চাঙ্গা হয়ে উঠতো। এজন্য তাকে কয়েক লাখ ডলার দিতে তারা কার্পণ্য বোধ করতো না। পত্রিকার পাতায় তিনি শিরোনাম হয়েছেন বারবার। শিকাগো বুলসে তার পরিহিত ২৩ নম্বর জার্সি পরিণত হয়েছে লিজেন্ডে। তার এয়ার জর্ডান জুতো কেনার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইউরোপের অনেক তরুণও সারা মাসের বেতন ব্যয় করতে প্রস্তুত।

তারকারা যে একটি প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রিয়েল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব। ২০০০ সালে তারা বার্সিলোনা থেকে পর্তুগিজ তারকা লুই ফিগোকে কেনে। রিয়ালের নতুন সভাপতি ফ্লোরেন্তিনা পেরেজ তার নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিগোকে কেনেন। অথচ প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে তাকে কিনতে গিয়ে রিয়ালের 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা হয়। সে সময় এমনকি রিয়ালের ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম বার্নাব্যু বিক্রি করে দেবার কথা পর্যন্ত উঠেছিলো। একদিকে ক্লাব ছিলো দেনার ভারে জর্জরিত, তার ওপর এতো অর্থের বিনিময়ে লুই ফিগোকে কেনা। কিন্তু পেরেজ ছিলেন তার নীতিতে অটল। পরের দু'বছর তিনি জিনেদিন জিদান ও রোনাল্ডোর মতো তারকাকে নিজ দলে ভেড়ান। ফলে স্পন্সররা এগিয়ে আসে। বিশ্বসেরা তারকাদের খেলা দেখার জন্য বার্নাব্যুর প্রতিটি চেয়ার দখল হয়ে যায় মুহূর্তেই। তারকাদের ইমেজ বিক্রি করে রিয়াল পরিণত হয় বিশ্বসেরা ক্লাবে। ফলে আর্থিকভাবে আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ। যে রিয়ালকে ২০০০ সালে নিজেদের স্টেডিয়াম বিক্রি করার কথা চিন্তা করতে হয়েছিলো, তারাই ২০০৩ সালে এসে পরিণত হলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্লাবে।

বেডরুমের ছোট পর্দায় গায়িকা ব্রিটনি স্পেয়ার্স এসে দাঁড়াচ্ছে মাইকেল জর্ডানের মতো বাস্কেটবল নিয়ে 'আসক্ ফর মোর' বলে। পেপসি এর জন্যে ব্রিটনিকে দেবে ৩০ মিলিয়ন ডলার। এ টাকা গান গেয়ে উপার্জনের চেয়ে অনেক বেশি

২০০২ সালে এই ক্লাবের বাৎসরিক উপার্জন ছিলো ১৮০ মিলিয়ন পাউন্ড। রোনাল্ডো, জিদান, ফিগোদের মতো তারকাদের দ্বারা সমর্থকরা প্রভাবিত হয়ে তাদের রেপ্লিকা টি-শার্ট, বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ও খেলার টিকেট ক্রয় করে। বিশ্বসেরা খেলোয়াড়দের ইমেজ কাজে লাগিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে পেরেজের দূরদর্শিতা থাকার কারণে রিয়াল আজ মাঠে ও মাঠের বাইরে বিশ্বসেরা ক্লাবে পরিণত হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় পেরেজ এ বছর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে কেনেন তারকা মিডফিল্ডার ডেভিড বেকহ্যামকে। রিয়ালের মাঝমাঠে জিদান, ফিগো, ম্যাকলেলে, গুটি, সোলারির মতো খেলোয়াড় থাকার পরও প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে বেকহ্যামকে নিজ দলে নিয়ে আসেন পেরেজ। এর কারণ যতোটা না তার খেলোয়াড়ি দক্ষতা, তারচেয়ে বেশি বেকহ্যামের জনপ্রিয়তা। এই বেকহ্যামের কাহিনীর মাধ্যমেই বোঝা যাবে তারকারা কিভাবে আমাদের প্রভাবিত করে।

আগেই বলা হয়েছে, এশিয়া হচ্ছে পণ্য বিক্রির এক আদর্শ ক্ষেত্র। পুরো এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় স্পোর্টস টিম ছিলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এ জনপ্রিয়তার মূল কারণ অনেকটাই ডেভিড বেকহ্যাম। জাপানের প্রতিটি রেলস্টেশনের

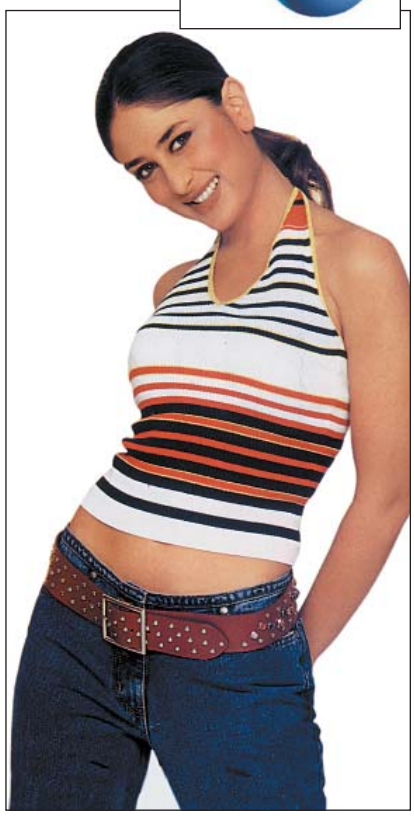

প্রতিটি ট্রেনের প্রতি কামরায় অন্তত দুটি করে বেকহ্যামের পোস্টার লাগানো আছে। চীন, হংকং, মালয়েশিয়ার তরুণ-তরুণীদের কাছে বেকহ্যামের জনপ্রিয়তা ঈশ্বরতুল্য। এশিয়া জুড়ে ম্যানইউ'র ১৭ মিলিয়ন ভক্ত আছে। মার্কেটিং বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সংখ্যা এখন কমবে। প্রায় ৫ মিলিয়ন ভক্ত বেকহ্যামের দলবদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও রিয়ালের ফ্যান হয়ে যাবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বেই ম্যানইউ'র সমর্থক সংখ্যা কমতে পারে। বিশ্বে রেড ডেভিলদের প্রায় ৭০ মিলিয়ন সমর্থক আছে। এর মধ্যে ব্রিটেনে রয়েছে ১৫ মিলিয়ন। এ সংখ্যাটি কমে গেলে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসেন ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করা যাবে না। কারণ এই ম্যানেজারের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই বেকহ্যাম দল ছেড়েছেন।

এশিয়াতে ম্যানইউ ফুটবল ক্লাব গত ৩ বছরে ২০টি নিজস্ব মেগা স্টোর খুলেছে। এসব স্টোরে মূলত বেকহ্যামের বিভিন্ন সামগ্রীই বিক্রি বেশি হতো। দোকানের মোট ৫০-৬০ শতাংশ আয় হতো বেকহ্যামের জার্সি, পুতুল ইত্যাদির বিক্রিলব্ধ অর্থ থেকে। এখন যে এশিয়াতে রিয়াল মাদ্রিদের নিজস্ব মেগা স্টোর গড়ে উঠবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর এক্ষেত্রে তাদের ব্যবসার মূল হাতিয়ার হবেন ডেভিড বেকহ্যাম।

মাইকেল জর্ডানের পর ডেভিড বেকহ্যামই হচ্ছেন 'হটেস্ট মার্কেটিং মেশিন'। তার মতো অন্য কেউ ক্রেতাদের এতোটা প্রভাবিত করতে পারেন না। এখন বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত স্পোর্টস সু হচ্ছে এডিডাস। কারণ ডেভিড বেকহ্যাম এডিডাস পরেন। ২০০২ সালের পর ভোডাফোন মোবাইল কোম্পানির বিক্রি বিশ্বব্যাপী এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যায়। কারণ বেকহ্যাম ভোডাফোন মোবাইল ব্যবহার করেন। তার প্রতিটি কার্যকলাপই তরুণরা অনুসরণ করে। এমনকি নখে নেইলপলিস দিলে কিংবা ভুরু কেটে ফেললেও সেটাই সুপারহিট। দু'দিন পর পর তিনি হেয়ার স্টাইল পাল্টান। নাপিতদের তাল রাখতে হয় নতুন ফ্যাশনের সঙ্গে। কারণ বেকহ্যাম হেয়ার স্টাইল বদল করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে তরুণরা সেলুনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নির্দেশ দেয় নাপিতদের, 'কাটো চুল বেকহ্যাম স্টাইলে'। অর্থাৎ বেকহ্যাম নিজেই এখন একটি ব্রান্ড। তিনি যে পণ্যের বিজ্ঞাপনের মডেল হবেন, সে পণ্যের বিক্রি তো বাড়বেই।

বিশ্বব্যাপী ক্রেতারা নিজেদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করছে 'বেকহ্যাম সামগ্রী' কেনার জন্য। এতে লাভবান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং একই সঙ্গে ডেভিড বেকহ্যাম। পেলে সারা জীবন স্যান্টোসে ফুটবল খেলে যতো টাকা উপার্জন করেন, এখন বেকহ্যাম এক মৌসুমেই উপার্জন করেন তারচেয়ে বেশি। কারণ পেলের সময় বিশ্বের মার্কেটিং পলিসি এমন ছিলো না। ২০০২ সালে বেকহ্যামের বার্ষিক আয় ছিলো ১৫.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। যেখানে ইংল্যান্ডের রানীর বার্ষিক আয় ছিলো ১৫.২ মিলিয়ন পাউন্ড। এ অর্থের বেশির ভাগই ছিলো স্পন্সরশিপ চুক্তি থেকে পাওয়া। পেপসি ও ভোডাফোন তাকে প্রতি বছর ২ মিলিয়ন পাউন্ড করে প্রদান করে। এডিডাস দেয় ২-৪ মিলিয়ন পাউন্ড। এ অর্থ কিন্তু জলে যাচ্ছে না। এডিডাস আশা করছে বেকহ্যামের ইমেজের কারণে আগামী ৪ বছরে তারা ১ বিলিয়ন ডলারের সামগ্রী বিক্রি করতে পারবে। বেকহ্যামের জীবনী লেখক এলিস ক্যাশমোর যেমন বলেছেন, 'বেকহ্যাম এডিডাসের জন্য তাই করবে, যা জর্ডান করেছিলো নাইকির জন্য। রিয়াল মাদ্রিদ যে তাকে ৪০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনলো, সেটাও বৃথা যাবে না। স্পোর্টস বিশেষজ্ঞ মাইকেল স্টারলিং যেমন মনে করেন, প্রতি বছর বেকহ্যাম রিয়ালের জন্য সরাসরি ৬-১০ মিলিয়ন ডলার আয় করবে। ব্রান্ড হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদ খুব শীঘ্রই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে।

এই যে আমরা বারবার বলছি, তারকারা আমাদের জীবন প্রভাবিত করে। কিন্তু এই তারকারা আসলে কারা? তারা তো আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। তাহলে তাদের কেন আমরা অনুসরণ করবো? তারা তো তারকা হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তাদের তৈরি করা হয়। বেকহ্যাম, ভিক্টোরিয়ার সন্তান ব্রুকলিন, রোমিও হয়তো জন্ম থেকেই তারকা। বিখ্যাত পিতা-মাতার কারণে। কিন্তু তাদের পিতা বেকহ্যাম তো তারকা হয়ে জন্মাননি। এক সময় তিনি ফুটবল গ্যালারিতে পড়ে থাকা পেপসির বোতল, ক্যানের কৌটা কুড়াতেন। এখন তিনি নিজেই পেপসির মডেল। পানীয়টির সঙ্গে বেকহ্যামের ব্রান্ড নেম যুক্ত করার জন্য পেপসি তাকে প্রতিবছর ২ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করে। নিজ পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে যখন তিনি ম্যানইউ'র খেলোয়াড় তালিকায় নিজের নাম লেখালেন, তখনই হয়তো ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এ ভাগ্য নির্ধারণ করে ব্রিটেনের বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান। তাদের সহায়তা করে ব্রিটিশ মিডিয়া। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর ব্রিটিশ মিডিয়া যেন পায় চার্লস-ডায়ানার যোগ্য উত্তরসূরিকে। বেকহ্যাম-ভিক্টোরিয়ার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথাই চলে আসে সংবাদ শিরোনামে। বেকহাম নিজ বাড়িতে থাকাকালীন স্ত্রী ভিক্টোরিয়ার অন্তর্বাস পরেন এমন খবরও ব্রিটিশ মিডিয়ায় বের হয়। বেকহ্যাম যা-ই করেন, যুবসমাজ তাতেই প্রভাবিত হয়। এটাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচারণা চালায়।

> **একজন ক্রিকেটপ্রেমী সাধারণ ভারতীয় কোল্ড ড্রিংক্স কিনতে গেলে পেপসি কেনেন, স্পোর্টস ওয়ার কিনতে গেলে এডিডাস কেনেন, 'সিক্রেট অব শচীন'স এনার্জি হিসেবে বুস্ট কেনেন, ভিসা কার্ডস, টিভিএস ভিক্টর, টুডে'স পেন কেনেন। পণ্যের গুণগত মানের সঙ্গে যুক্ত হয় শচীনের 'ব্রান্ড নেম'**

ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এক দশক আগেও এতোটা রমরমা ছিলো না। কিন্তু মিডিয়া এক সময় ফিল্মকে ভারতের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি হিসেবে ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে চলে ব্যাপক প্রচারণা। এ কারণেই প্রথম ছবি করেই ঋত্বিক রোশন হয়ে যান সুপারস্টার। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এমন নজির নেই। তার প্রথম ছবি বাদ দিলে ঋত্বিক তার কেরিয়ারে আর একটি ছবিও হিট করাতে পারেননি। তবুও

তিনি সুপারস্টার। তার এই সুপারস্টার ইমেজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই জরুরি। সে কারণে ফ্লপ মাস্টার হয়েও ঋত্বিক এখন সুপারস্টার।

প্রত্যেক ভারতীয় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে দাঁড় করিয়েছেন। কোনো দেশে অমিতাভ-শাহরুখরা বেড়াতে গেলে সে দেশের ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে তাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। তারা যে অনেক বড় তারকা সেটা ভিনদেশীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথচ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। ঋত্বিকের 'কোই মিল গায়া' ছবি মুক্তির আগেই দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি এ ছবিটি হলে গিয়ে দেখার ঘোষণা দিয়েছেন। এটা ছবি এবং ঋত্বিকের জন্য অনেক বড় প্রচারণা।

তারকা তৈরির ক্ষেত্রে একই কথা বলা যায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে। এক টুর্নামেন্ট ভালো খেলেই যুবরাজ সিং হয়ে যান সেনসেশন। বীরেন্দর শেওয়াগ ২-১ ইনিংসের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের কারণে 'নতুন শচীন' খেতাব পান। টিভির অ্যাডে ভেঙ্কটেস প্রসাদের বলের গতি তুলনা করা হয় গোলার সঙ্গে। কিন্তু এ সবই প্রচারণার কৌশল। শেওয়াগ, যুবরাজ কিংবা প্রসাদের চেয়ে অনেক ভালো ক্রিকেটার রয়েছে অন্যান্য টেস্ট প্লেয়িং দেশে। কিন্তু তাদের নিয়ে ততটা মাতামাতি হয় না। কারণ তারা ভারতে জন্মেনি। তাদের দেশের মার্কেট ভারতের মতো এতো বিশাল না।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আমাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু আমাদের নয়, তারকাদের জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে। জাহিদ হাসান এশিয়ান সিগারেটের অ্যাড করেছেন। তিনি জানতেন এই অ্যাড করার জন্য তাকে প্রচুর নিন্দার সম্মুখীন হতে হবে। তবুও তিনি করেছেন। ১৮ লাখ টাকার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া সহজ নয়। ম্যারাডোনা যে তার পুরো কেরিয়ার জুড়ে অসংখ্যবার 'ভুল' কারণে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন, সেটা কি সব সময় নিজের দোষে? না, অনেক সময় ম্যারোডোনার স্পন্সর করা প্রতিষ্ঠানগুলো পত্রিকার মাধ্যমে তাকে আলোচনায় রাখতে চেয়েছেন। সেজন্যই তার এতোবার সংবাদ হওয়া। বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা মাইক টাইসন ও লেনেক্স লুইস যে ম্যাচ-পূর্ব এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন, সেটাও কি ইচ্ছাকৃত নয়? অথবা বক্সিংয়ের টিকিট বিক্রেতাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল নয়? টাইসন-লুইস ম্যাচের আগেই এরকম মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে ঐ বক্সিং ম্যাচের প্রতিটি টিকিটই বিক্রি হয়ে যায়। প্রচারণার এ অভিনব কৌশলে তারকাদের নিয়ন্ত্রণও তাই তারকাদের কাছে থাকে না।

আসলে আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রই প্রভাবিত করছে তারকারা। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। তারাই ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কি খাবো, কি পরবো, কেমন হবে আমাদের

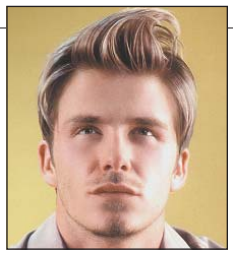

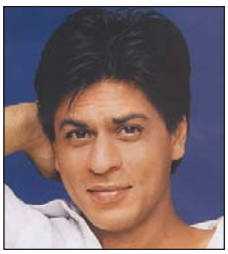

এই যে আমরা বারবার বলছি, তারকারা আমাদের জীবন প্রভাবিত করে। কিন্তু এই তারকারা আসলে কারা? তারা তো আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। তাহলে তাদের কেন আমরা অনুসরণ করবো?

জীবন যাপনের ধরন। তারা যখন আমাদের জিন্স পরতে বলে, তখন আমরা তাই করি। স্কিন টাইট, স্ট্রেইট, ব্যাগী- যখন যেটা পরতে বলে তখন সেটাই পরি। কিন্তু সাধারণটা পরি না, পরি ব্রান্ডেরটা। একই জিন্স ব্রান্ডের নাম ছাড়া কিনতে বললে আমরা কিনবো না। কিন্তু এর সঙ্গে কেলভিন ক্লেইন ব্রান্ডের নাম যুক্ত হলে আমরা কিনি। কারণ এ জিন্স পরেন ব্রুক শিল্ড। আমাদের ফিগার কেমন হবে, সেটাও নির্ধারণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। নারী মুক্তি আন্দোলনের সময় ফ্ল্যাট বুকের একটা ফ্যাশন চালু হয়। ফ্ল্যাট বুকের টুইগি-রা ব্রা'র মডেল হলো। আবার আশির দশকের শেষ দিকে তারা ফ্যাশনে নিয়ে এলো সুঠাম বক্ষকে। ফলে সিন্ডি ক্রাফোর্ড, নওমি ক্যাম্পবেলকে দিয়ে অ্যাড করালো। ই-ক্যাপ বাজারজাত করার পর শ্যারন স্টোন, ডেমি মুর তারকা হলেন। এলেন পামেলা অ্যান্ডারসন। এসব আইকনদের দেখে সাধারণ রমণীরা তাদের বুকের আকৃতি নির্ধারণ করতো। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ছোট নিতম্বের ফ্যাশন চালু। ফলে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ নারীরা যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য নিতম্ব ছোট করে ফেলতে চাইছে। সারা দিন জিম ওয়ার্ক করছে। অর্থাৎ সে জানে না, তার বুক কিংবা নিতম্বের আকৃতি কিরকম হবে। তাকে প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারণ করে দেয়। ম্যাডোনা যখন ছোট প্যান্ট পরে, যার নাম বিল্ডার্স বাম, তখন সেটা সুপারহিট হয়ে যায়। এক দিনে ঐ রকম লাখ লাখ প্যান্ট বিক্রি হয়। সেটা ক্রেতারা পছন্দ করেই কেনে। যদিও সে পছন্দ তাদের নিজেদের নয়। তারকাদের, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের।

বিশ্বের সবচে' বড় বাজার এখন এন্টারটেইনমেন্ট ও আইটি। দুটোই আবার মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্যের খবর। কয়েকটি 'আইকন' দিয়ে মানুষের অভ্যাস, সাধ-আহ্লাদ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ওরা চ্যানেল ও আইটির মাধ্যমে মানুষকে আইকন নির্ভর করছে। উৎপাদন হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু আইকনের প্রধান মূল্যটা উঠছে তাদের ঘরে। পেটেন্ট করা হচ্ছে সবকিছু। যেমন আমের নাম ল্যাংড়া, ফজলী বা চোষা। এরপর হয়তো আসবে কোন কোম্পানির সিল। গ্রামের কিশোরী বড়ই খাবে না, কিশোর ছেলেটি স্মৃতিকথায় পেয়ারা গাছের কথা বলবে না, আরজ আলীর ডাব হবে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন। অথবা সবই চলে যাবে কোম্পানি সিলে। সেটা হতে পারে মাল্টিন্যাশনাল বা প্রাণ। যেমন এখন গরুর দুধ বলি না, বলি আড়ং দুধ বা মিল্ক ভিটা।

আমাদের পূর্বসূরিরা ম্যাটিনি শো দেখতেন দল বেঁধে, ওটা ছিল সামাজিক বিষয়। এখন ম্যাচ বক্স ফ্ল্যাটের ছোট ঘরে সবাই বন্দী। বাইরে ট্রাফিক জ্যাম, মাস্তান। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। বসার ঘরে বা শোবার ঘরে টিভিতে চলছে বিভিন্ন নাটক বা সিরিয়াল। বন্ধু নয়, আলোচনা নয়, মনন নয়, সঙ্গী হয়ে ওঠে সিরিয়ালের চরিত্ররা। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। অথচ পণ্য ক্রয়ে পৃথিবী কত কাছাকাছি!

ম্যাট্রিক্সের ছবিতে দেখানো হয় আমাদের জীবন কম্পিউটারের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য আমরা তা জানি না। আমরা যেন কখনো তা না জানতে পারি সেজন্য এজেন্ট আছে পাহারাদার হিসেবে। এজেন্ট, প্রোগ্রামের ইচ্ছে মতোই আমরা সব কাজ করি। পছন্দ-অপছন্দ সবই প্রোগ্রামের ফলাফল। সিনেমাটি পুরোপুরি ফিকশন। অথচ আমরা যদি আমাদের বর্তমান জীবনের দিকে একটু সূক্ষ্মভাবে তাকাই তাহলে কী দেখব? আমাদের পছন্দ-অপছন্দের নিয়ন্ত্রক কে? আমরা নিজেরা, তারকা না কি প্রতিষ্ঠানগুলো? আসলে আমরাও ম্যাট্রিক্সের জীবনযাপন করছি। এখানে এজেন্ট হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক। আর তারকাদের মোহে আমাদের চাহিদা নির্ধারিত হচ্ছে।